এই সময়
সংবাদপত্র

কথা সরিৎ

ক্ষমতা কেউ দেয় না, অর্জন করতে হয়। এই অর্জন করার প্রক্রিয়াটিই আসলে ক্ষমতায়ন।
গ্লোরিয়া স্টাইনেম

সকলই তোমারই ইচ্ছা?

অন্য কারও সার্বভৌমত্ব আমেরিকার দয়ার দান নয়

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আসে বিয়োগান্ত নাটক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে তার চরিত্রটি প্রহসনমূলক, অ্যাবসার্ড নাট্যসম। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণে একনায়কের অপসারণ ও গণতন্ত্র 'রপ্তানি'র অসত্য প্রেক্ষিতে দেশটিকে ছিন্ন করে তারা, আইসিস-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠী জন্ম নেয়, পশ্চিম এশিয়া আরও অস্থির হয়। উত্তর আফ্রিকাতেও তা-ই। ২০২৬ ভেনেজুয়েলায় সাম্রাজ্যবাদী চিত্রনাট্যের পুনরভিনয় দেখল। বোমাবর্ষণ ও নৌ-অবরোধে দমনমূলক কূটনীতি করল ট্রাম্প প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর অপহরণে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের ধারা ২ প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হলো। মাদকবিরোধী অপারেশনের প্রমাণহীন ছদ্মবেশে ক্যারিবিয়ান সাগরে তেলের ট্যাঙ্কার আটকে এবং বেআইনি ভাবে নৌকারোহী নাগরিকদের হত্যা করে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে নিজেকে বিচারপতি ও শাস্তিদাতার আসনে বসাল আমেরিকা। হস্তক্ষেপের হিসেব পুরোনো— প্রথমত, আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনরো মতবাদের পুনর্জাগরণ, যা কিউবার সঙ্গে বিকল্প জোটের মাধ্যমে উল্টে দিচ্ছিল ভেনেজুয়েলা, ও দ্বিতীয়ত, চিনের সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার জোট ভেঙে দেওয়া, কেননা তৈল-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে পূর্বমুখী হচ্ছিল মাদুরো সরকার। তৃতীয় কারণটি ভেনেজুয়েলার সুবিস্তীর্ণ অপরিশোধিত তেলভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণের মতো বিদ্বেষমূলক, কারণ সেই সম্পদ মার্কিন বাণিজ্যের পক্ষে 'পুরস্কার'স্বরূপ।

আমেরিকা জয়ের দাবি করলেও তাকে মূল্য চোকাতে হবে। মাদুরোর শাসন কর্তৃত্ববাদী হলেও তাঁর ইউনাইটেড সোশালিস্ট পার্টি অফ ভেনেজুয়েলা-র পোক্ত সমর্থনভিত্তি আছে। মার্কিন-সমর্থিত ভূতপূর্ব অভিজাত জমানাগুলি যে দগদগে অসাম্যের সাক্ষী ছিল, তার মোকাবিলায় বলিভারিয়ান আন্দোলনের উত্থান। গা-জোয়ারি করে নতুন ব্যবস্থা বসালে প্রমাণিত হবে, আমেরিকা জনতাকে 'মুক্তি' দিচ্ছে না, ঔপনিবেশিক লুঠের ভয় বাড়াচ্ছে। দ্বিচারিতা স্পষ্ট— ট্রাম্প প্রশাসন যখন মাদুরোকে জনসমর্থনহীন পাচারকারী বলে তাঁর অপসারণের পক্ষে সাফাই দিচ্ছে, তখনই তারা মাদক পাচারে অভিযুক্ত হন্ডুরাসের প্রাক্তন নেতা হুয়ান অরলান্দো হের্নান্দেজের মুক্তির নির্দেশ দিচ্ছে, ওয়াশিংটনপন্থী নাসরি আসফুরা-র উত্থানে সহায়তা করছে। ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বায়িত ও পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবী সুস্থিত ও উদার বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দেবে বলে যে আশা ছিল, আমেরিকার কার্যকলাপে তা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। ট্রাম্পবাদ নামক এককবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জমানার স্বাভাবিক ও হিংসাত্মক উপসংহার ভেনেজুয়েলা দখল।

পড়ার অধিকার

বিশ্বের বহু উন্নত দেশে বইয়ের দাম নাগরিকদের আয়ত্তের মধ্যে বেঁধে রাখার ব্যবস্থাটি রাষ্ট্র আইনসভায় বরাবরের মতো অনুমোদন করিয়ে রেখেছে। বই-খাতার ওপর শুল্ক চাপানোর মতো অত্যাশ্চর্য ঘটনা মানব ইতিহাসে আগে কখনও কেউ ভেবে উঠতে পারেনি, হয়তো খানিকটা চক্ষুলজ্জাবশতই। কে কোন বই পড়বে, তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা রাষ্ট্র সব সময়ে করেছে, তবে কোনও না কোনও বই যে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অন্যতম, তা মগজ থেকে ছেঁটে ফেলা খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া তার প্রাথমিক পদক্ষেপ। স্কুলছুটের যুক্তিতে এমনটা করতে যে অসুবিধে নেই, তাও ভারতে বহু সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া থেকেই পরিষ্কার। এমতাবস্থায় শহরের স্কুলগুলিতে পুস্তক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করা হয়তো খানিকটা হাস্যকর মনে করেই কিছু শিক্ষক নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরাই চাঁদা তুলে পুস্তক দিবস পালন করেন বলে খবরে প্রকাশিত। 'অ-শিক্ষিত' নাগরিকরা কিছুকাল নির্বিবাদে চোখ, কান বন্ধ করে শিষ্ট অনুগামী হয়ে থাকে ঠিকই, তবে অন্ধ ভক্তের মতাদর্শগত অবস্থানটি সুস্পষ্ট চিন্তার দ্বারা নির্মিত নয় বলেই, ডিগবাজি খেয়ে স্রষ্টাকেই গিলে খাওয়ার নজির সর্বত্র। স্কুল বন্ধের কারিগররা সাবধান।

অ সং খ্যা

৫০০০০০

(পাঁচ লক্ষ)— ২০২৫-এর অক্টোবর অবধি পশ্চিমবঙ্গে যতজন শ্রমিক হোসিয়ারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সূত্র: www.pib.gov.in

দি ন কে দি ন

৬ জানুয়ারি

১৯৬৭: আল্লারাখা রহমান (এ আর রহমান) জন্মগ্রহণ করেন চেন্নাইয়ে। জন্মসূত্রে তাঁর নাম ছিল এ এস দিলীপ কুমার। মণিরত্নমের 'রোজা' ছবি দিয়ে তিনি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করেন।

১৯৭১: প্রখ্যাত জাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকার ওরফে পি সি সরকার প্রয়াত হন জাপানে। ১৯৬৪ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালে দু'বার 'দ্য ফিনিক্স' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অনন্তকে উপলব্ধি

কেশবচন্দ্র সেন

বোধি বৃক্ষ

অনন্ত সংযোগ না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে না। অতএব ঈশ্বরের কোন স্বরূপকে অনন্তবিশিষ্ট মনে করিও না। ব্রহ্ম যিনি তিনি অনন্ত আকাশস্বরূপ। প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আকাশস্বরূপ। এই কথাটি সেবকের মনে অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। ঈশ্বরের কোটি কোটি রূপের মধ্যে তিনি আকাশস্বরূপ। তাঁহার প্রধান লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি যত রূপ দেখ না কেন প্রত্যেকটি আকাশস্বরূপ। যখন তাঁহাকে লক্ষ্মী ভাবিবে তাঁহাকে আকাশস্বরূপা লক্ষ্মী ভাবিও, সাকার লক্ষ্মী ভাবিও না। ঈশ্বরকে আকাশস্বরূপ ভাবিলেই তাঁহার কোন আকার অথবা হস্ত পদ চিন্তা করা অসম্ভব। যদি ব্রহ্মের এই আকাশস্বরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ না কর তবে যোগ ধ্যানের সময় যতই কেন কল্পিত মূর্তি বিদায় করিবার চেষ্টা কর না, বারবার সেই সকল কল্পিত মূর্তি আসিয়া তোমার দুর্বল মনকে আক্রমণ করিবে। তুমি অনেক সতর্ক হইয়া নিরাকার ব্রহ্মপূজা আরম্ভ করিলে; কিন্তু অর্দ্ধেক পথে যাইতে না যাইতে দেখিবে তোমার নিরাকার দেবতা যেন সাকার হইয়া যাইতেছেন, তিনি যেন কখন ভীষণ রূপের চক্ষু কখন মনোহর সহাস্য বদন দেখাইতেছেন, কখন মঙ্গলহস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন, কখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া পাপাত্মাদিগকে প্রহার করিতেছেন। সাধক, তুমি অনেক সাবধানতার সহিত ব্রহ্মের নিরাকারত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে; কিন্তু তোমার পুরাতন অভ্যাসবশতঃ তোমার মন গোপনে ঈশ্বরের নানাবিধ পরিমিত রূপ গঠন করে। ('সেবকের নিবেদন' থেকে গৃহীত)

সংসদে 'বন্দেমাতরম' বিতর্কে আপাত দৃষ্টিতে বিজেপির নিশানা নেহরু, আদতে লক্ষ্য গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

গান্ধীজির বদলে রামজি, ছকটা বোঝা কঠিন কি

মহাত্মা গান্ধীই হিন্দুত্ববাদী ভারতের ভাবনা রূপায়ণের পথে সব থেকে বড় বাধা। তাই আরএসএস-এর শতবর্ষে তাঁকে সরাসরি আক্রমণ না করে পরোক্ষ ভাবে মুছে দেওয়ার কাজটা শুরু করল বিজেপি। লিখছেন **শুভাশিস মৈত্র**

মুখোমুখি। শান্তিনিকেতনে আলাপরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী

বিজেপি এখন আর শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, এক বিশেষ সামাজিক মানসিকতা। অবশ্যই একটি রাজনৈতিক আদর্শও। বিজেপি-র ভোটার হয়তো ৩৬-৩৭% থেকে বাড়েনি গত বারো বছরে, কিন্তু বিজেপি-মানসিকতার প্রভাব জনসমাজে বাড়ছে। সেটাই শতবর্ষে আরএসএস-এর বড় সাফল্য।

বিজেপি-মানসিকতা বৃহদর্থে রাজনৈতিক-হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা। যার ভিত্তি, এক দিকে সংখ্যালঘু-ঘৃণা, অন্য দিকে ধর্মভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদ। বিজেপি-মানসিকতা বিষয়টি স্পষ্ট করতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেএনইউ-এর উপাচার্য শান্তিশ্রী ধুলিপুড়ি পণ্ডিত। শান্তিশ্রী একটি ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, যে ভাবে সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে জামিন দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শনিবারে ছুটির দিনে আদালতে হাজির হন এবং তিস্তার জামিনের পক্ষে রায় দেন, এমন ঘটনা এখনও 'আমাদের লোকেদের ক্ষেত্রে ঘটে না'। তিনি বলেছিলেন, তাঁরা ভারতে এমন পরিবেশ তৈরি করতে চান, যেখানে 'আমাদের ক্ষেত্রেও' এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যাবে। খুবই পরিশীলিত ভাষায় বলেছেন। কিন্তু এই 'আমাদের' লোকের সংখ্যা বাড়ছে। আর এই 'আমাদের' রাজত্বে 'ওদের' (উদার, ধর্মনিরপেক্ষ) আইকনদের জায়গা থাকবে না। এখান থেকেই দেখতে হবে মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার ঘটনাটিকে।

'আমাদের' লোকরাই অটলবিহারীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে গ্রাহাম স্টেইনস-কে দুই শিশু-সহ পুড়িয়ে মেরেছিল। হিন্দুত্ববাদী নেতারা নীরব ছিলেন। 'আমাদের' লোকেরাই চার্চে চার্চে হামলা চালিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী নেতারা চুপ। কারণ তাঁদের লক্ষ্য, ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের পিছনের সারিতে ঠেলে দাও। যাতে একটা সময়ে তারা নিজেরাই মেনে নেয়, তারা প্রথম শ্রেণির নাগরিক নয়। সেই কারণেই গণপিটুনিতে নিহত আখলাকের খুনে অভিযুক্তদের একজনের মৃতদেহ (স্বাভাবিক মৃত্যু) বিজেপি-র মন্ত্রী জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন। আর এক মন্ত্রী মাংস-বিক্রেতা আলিমুদ্দিন আনসারির খুনে অভিযুক্তদের বাড়িতে ডেকে মালা পরিয়ে মিষ্টি খাওয়ানোর ছবি প্রকাশ করেন। এবং, উন্নাওয়ের ধর্ষককে শাস্তি থেকে রেহাই দিলে তাঁরাই, যেন কিছুই ঘটেনি, এমন মুখ করে চুপ করে থাকেন। বিলকিস বানোর ধর্ষকরা জেল থেকে মুক্তি পেলে বহু মানুষ তাদের মালা পরায়। এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। প্রতিরোধী আন্দোলন দুর্বল, তাই এই মানসিকতা বেড়ে চলেছে বিনা বাধায়।

কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারীর কথা অনবরত বলেই চলেছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ থেকে শুরু করে নিচুতলার বিজেপি-র নেতারা। বিহারের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন কমিশন 'অনুপ্রবেশকারী' বিষয়ে বিজেপি-র পক্ষে যায়, এমন কোনও তথ্য দিতে পারছে না। তবুও কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় এসে বলে গেলেন যে, এ বারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট হবে অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে? কারণ, তাঁরা অনুপ্রবেশকারীর কথা ক্রমাগত বলে বলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দূরত্বটা জিইয়ে রাখতে চান। ঘৃণা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে, এ তারই মন্ত্রপাঠ।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হলো, সেটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম গানে 'তুষ্টিকরণ'-এর স্বার্থে কারা কাঁচি চালিয়েছিল, এবং তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা নিয়ে। যারা এ কাজ করেছিল তারা 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল', এটা ছিল বিজেপি-র প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথমে মনে হয়েছিল, আক্রমণের লক্ষ্য নেহরু। পরে বোঝা গেল, লক্ষ্য আরও বৃহৎ। বিজেপি খুব ভালো করেই জানে যে, বন্দেমাতরম গানকে সমগ্র ভারতবাসীর গানে পরিণত করার জন্য যে কাটছাঁট করতে হয়েছিল, তার পিছনে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, সুভাষ, প্রত্যেকের স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। তবু তারা নেহরুকে আক্রমণ করার নাম করে এই বিতর্ক উস্কে দিয়ে তাদের সমর্থকদের সামনে আসলে কাঠগড়ায় তুলল গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথকে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে কেন তারা এটা করবে! আসলে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের থেকেও হিন্দুত্ববাদীদের কাছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'বন্দেমাতরম: বায়োগ্রাফি অফ আ সং' এবং সুগত বসুর 'দ্য নেশন অ্যাজ় মাদার' বইয়ে বন্দেমারতম নিয়ে এই সব বিতর্কের সমাধান বহুকাল আগেই হয়ে গিয়েছিল। বিজেপির লক্ষ্য এই ক্ষেত্রে শুধু নেহরু নয়, আসল লক্ষ্য গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ, কারণ, এই দু'জন মানুষ কোনও অবস্থাতেই বিজেপি-র ভারত-ভাবনার সঙ্গে সমঞ্জস নন। উদার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাকে দেশ থেকে বিদায় করতে চাইলে আক্রমণটাকে ওই দিকে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু সরাসরি তাঁদের আক্রমণ করার সাহস এখনও হয়নি। কিন্তু শুরুটা হলো এই ভাবে।

শুরুটা সংসদের বাইরেও হয়েছে। 'অর্গানাইজ়ার'-এর ওয়েবসাইটে যখন লেখা হয় (জুলাই ২০২৫) ভারতীয় সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি একটি 'ল্যান্ডমাইন' বা যখন গোয়ায় আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন (ডিসেম্বর ২০২৫) 'সত্যের থেকে শক্তি অনেক বড়', তখন পরিষ্কার বোঝা যায় ভারত-ভাবনা বলতে এত দিন যা বুঝে এসেছি, সেটার শিকড় ধরে টান মারছে হিন্দুত্ববাদীরা। তারা জয়ী হবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে। এখানে বলে নেওয়া ভালো, আম্বেদকর যে কারণে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংবিধানে অনুল্লিখিত রেখেছিলেন, সেটার কারণ ছিল এক বৃহত্তর ধর্মনিরপেক্ষ-অনুভব। হিন্দুত্ববাদীদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনারই বিরুদ্ধে তারা।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন। আরএসএস আনন্দের চোটে মিষ্টি বিলি করল। আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করলেন বল্লভভাই প্যাটেল। গডসে তাদের লোক নয়, দাবি করল আরএসএস। যদিও তার পর প্রায় ৭৭ বছর কেটে গেল, হিন্দুত্ববাদী নেতাদের মুখে কোনও দিন গডসে-র সমালোচনা শোনা যায়নি। গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব পেয়ারেলাল নায়ারের 'মহাত্মা গান্ধী: দ্য লাস্ট ফেজ়' থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসা চলছে। গোলওয়ালকর এলেন গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধী বললেন, তিনি শুনেছেন সাম্প্রদায়িক হিংসার রক্তের দাগ তাদের হাতেও (আরএসএস) লেগে আছে। গোলওয়ালকর বললেন, এ অভিযোগ মিথ্যা, আরএসএস কারও শত্রু নয়, আরএসএস শুধুমাত্র হিন্দুদের পক্ষে। গান্ধী বিশ্বাস করলেন সে কথা এবং বললেন গোলওয়ালকর যেন সাম্প্রদায়িক হিংসার নিন্দা করে একটি বিবৃতি দিয়ে এই কথাগুলো বলেন। গোলওয়ালকর কিন্তু সেই বিবৃতি দিলেন না। এর কয়েক দিন পর গান্ধী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দিল্লিতে আরএসএস-এর একটি জমায়েতে। ক্ষমা, শান্তি নিয়ে কথা বলেছিলেন তিনি সেই সভায়। সেখানে গান্ধীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছিল। এই গান্ধীই হিন্দুত্ববাদী ভাবনার প্রসারে প্রধান প্রতিবন্ধক। পাহাড়ের মতো লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপে দীর্ঘ দিন গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নিচু করে ছিল বিজেপি। কিন্তু আরএসএস-এর শতবর্ষে তারা এই সব ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করল। বিল থেকে গান্ধীর নাম মুছে দেওয়াটা তাই একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

গান্ধীর নাম মুছে 'রামজি' নাম দিয়ে মনরেগা বিল আনলে যে সংসদে এবং সংসদের বাইরে প্রতিবাদ হবে, তা বিজেপি জানত। এই প্রতিবাদ, এই বিতর্কই তারা চাইছে। এটা জল মাপাও বটে। সফল হলে তাদের এই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এ নতুন গতি আনবে হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্ব।

কৃষি বিল সংসদে পাশ হয়েও রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ১২৫ দিন কাজের রামজি বিল সংসদে পাশ হয়েছে। কংগ্রেস ১০ জানুয়ারি থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। কংগ্রেস পারবে মুছে দেওয়া গান্ধীর নাম পুনরুদ্ধার করতে? রাহুল গান্ধী 'ভারত জোড়ো যাত্রা', 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র মধ্যে দিয়ে নিজের এবং কংগ্রেসের মলিন মুখে কিছুটা আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। লোকসভা ভোটে তার কিছুটা ঝলক দেখা গেলেও, পর পর বিধানসভা ভোটে করুণ পরিণতি প্রমাণ করে, সেটা তিনি ধরে রাখতে পারেননি। অন্য দিকে, ভোট-চুরির অ্যাটম বোমা, বিহারের ভোটার অধিকার যাত্রা কংগ্রেসকে কোনও বাড়তি শক্তি জোগায়নি। এটা ঠিক যে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 'সংবিধান বাঁচাও' ডাক সর্বভারতীয় পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু এই সব আন্দোলনের সঙ্গে আর্থিক ভাবে সব থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষদের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ১০ জানুয়ারি থেকে কংগ্রেস যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে দেশের ৮.৬ কোটি জব কার্ড হোল্ডারের। এর মধ্যে মাত্র ৪১ লক্ষ পরিবার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মনরেগায় কাজ করেছেন। কংগ্রেস কি মানুষকে বোঝাতে পারবে, নতুন আইনে ১২৫ দিনের কথা বলা হলেও বাস্তবে কাজ পাবে অনেক কম মানুষ? বহু দিন পর কংগ্রেস মানুষের রুটি-রুজির বিষয় নিয়ে রাস্তায় নামছে। পরীক্ষা কঠিন।

কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে সিদ্দারামাইয়া এবং ডি কে শিবকুমারের প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। শশী থারুরের বিভিন্ন মন্তব্য দলের ভাবমূর্তিতে ক্রমাগত আঘাত হানছে, কংগ্রেস নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয়। দিগ্বিজয় সিং আরএসএস-এর সংগঠনের প্রশংসা করছেন, তাঁকে সমর্থন জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বিবৃতি দিচ্ছেন। রাহুল গান্ধীর থেকে প্রিয়ঙ্কার সম্ভাবনা অনেক বেশি, এই আলোচনাও নতুন করে শুরু হয়েছে। ফলে মহাত্মা গান্ধীর নাম পুনরুদ্ধারে কংগ্রেসের এই আন্দোলন নানা কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরালা, তামিলনাড়ু ভোটের আগে গান্ধীর ছবি হাতে রাস্তায় হাঁটবে কংগ্রেস। দুই আদর্শের লড়াইটা শেষ পর্যন্ত রাস্তাতেই হওয়ার কথা। এটা কি তারই মহড়া!

গান্ধী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দিল্লিতে, আরএসএস-এর একটি জমায়েতে। সেখানে গান্ধীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছিল।

তিরন্দাজি। 'অগ্রণী' পত্রিকার কার্টুন ▶

লেখক সাংবাদিক

পায়ে গরম

সুখী রোজদিন

এ বারে যা ঠান্ডা পড়েছে কয়েক দিন ধরে জাঁকিয়ে, তাতে হাত-পা সব গুটিয়ে যাচ্ছে বললে কম বলা হয়। হাতে পায়ে মোজা পরে বসে আছে বাঙালি। সঙ্গী মাঙ্কি ক্যাপ। ঠান্ডায় যতটা আরাম খুঁজে নেওয়া যায়, আর কী! শীতের দেশে অবশ্য আগেকার দিনে, হয়তো এখনও ঘরের মধ্যেই থাকত আগুন পোহানোর ব্যবস্থা। আমাদের গরমের দেশে শীত পড়লে আছে রোদ পোহানোর ব্যবস্থা। কিন্তু ক'দিন ধরে নিম্নচাপের চক্করে রোদ পোহানোর অপশনও নেই। তা হলে হাতে রইল কী? রুম হিটার।

সত্যি কথা বলতে কী, শীতের দুপুরে বা রাতে যখন সর্বাঙ্গ থরহরি কম্প, বিশেষত পায়ের হাড়গুলোতে যেন ঠান্ডার সূচ বিঁধছে লক্ষ, তখন রুম হিটার চালিয়ে তার সামনে পা মেলে ধরার মতো আরাম হয় খুব কমই। পারলে একটু হাত সেঁকে নেওয়া। ওই উষ্ণতাতে ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে দেহের জড়তা। আর উষ্ণতার সেই আরামবোধের জন্যই হয়তো এই শীত আমাদের কাছে আদরের, আহ্লাদের।

আমরা গরমের দেশের মানুষ। শীত বলতে মাত্র ক'টি দিন এখানে। তার উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের ঠেলায় তো সেই শীতেও ঠান্ডা নেই। কিন্তু ওই যে ক'টা হাতে গোনা দিনে সত্যিই শীত পড়ে এখানে, সেই দিনগুলিতেই শীতের পরশের সঙ্গে সঙ্গে আদরে আশ্লেষে মেখে নিতে হয় এমন উষ্ণ তাপের আস্বাদ।

তাপ বলতে যেখানে আমরা দমবন্ধ করা স্যাঁতসেঁতে ঘাম আর কষ্ট বুঝি, সেখানে শীতের চাদরে এমন লোভনীয় উত্তাপ বড় মায়াময়। তাতে একটু আহ্লাদ করার সুযোগ। নিজের সঙ্গেই নিজের।

গত বৃহস্পতিবারের ক্যাপশন:
'শুধু যাওয়া আসা'
পাঠিয়েছেন: সুমালী দাস চ্যাটার্জি, নাকতলা, কলকাতা ৪৭

তিন শব্দের ক্যাপশন মেল করুন। সাবজেক্টে লিখুন 'সুখী রোজদিন'। মেল ঠিকানা: pratisampadak.eisamay@gmail.com

প্র তি স ম্পা দ ক

কচুরিপানা সর্বনাশা, সচেতনতা কোথায়?

'সবুজ মানেই জীবন'— এই আপ্তবাক্যটিই আজ পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমিতে মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। নদী, খাল বিল আর পুকুরের বুকে যে সবুজ চাদর নিঃশব্দে বিছিয়ে পড়েছে, তা জীবনের নয়, মৃত্যুর। আর এই মৃত্যুদূতের নাম কচুরিপানা, বা 'ওয়াটার হায়াসিন্থ' (বৈজ্ঞানিক নাম 'আইকোর্নিয়া ক্রাসিপেস') যার দাপটে বাংলা নিজের জলজ পরিচয় হারানোর পথে।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে, আনুমানিক ১৮৯০-এর আশেপাশে, ব্রাজ়িল-এর অ্যামাজ়ন অববাহিকা থেকে এই উদ্ভিদটি ভারতে আনা হয়, নিছক সৌন্দর্যায়নের জন্য। বিদেশি বলেই আকর্ষণ, বড় পাতার জাঁকজমক আর মনোরম বেগুনি ফুলের সৌন্দর্য দেখেই কচুরিপানাকে বাগানবাড়ির পুকুর ও রাজবাড়ির জলাশয়ে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তখন একে মনে করা হয়েছিল রুচির নিদর্শন। কিন্তু পরিবেশগত বিবেচনার অভাবে এই শৌখিন সৌন্দর্যই অচিরেই বাংলার জলজ বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে।

সমস্যা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ১৯৩৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 'বেঙ্গল ওয়াটার হায়াসিন্থ অ্যাক্ট' পাশ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, একশো বছর আগেই প্রশাসন বুঝেছিল। এই আগাছা শুধুমাত্র পরিবেশগত নয়, অর্থনৈতিক সংকটেরও কারণ। অথচ আজ এক শতাব্দী পর, সেই বিপদ আরও বহু গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে।

কচুরিপানা একটি ভাসমান, বহুবর্ষজীবী ও অতি-আগ্রাসী জলজ আগাছা। এর বংশবৃদ্ধির হার এতটাই বিস্ময়কর যে, অনুকূল পরিবেশে মাত্র দশটি চারাগাছ আট মাসের ব্যবধানে প্রায় ছ'লক্ষ নতুন চারার জন্ম দিতে পারে। এর ফলে জলের উপরিভাগ সম্পূর্ণ দখল হয়ে যায়। সূর্যের আলো তলদেশে পৌঁছতে পারে না, জলজ উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষে ব্যর্থ হয়ে পচে যায়। আরও ভয়ংকর হলো, এই আগাছা জল থেকে অধিকাংশ দ্রবীভূত অক্সিজেন শুষে নেয়। অক্সিজেনের এই চরম ঘাটতি বা 'হাইপোক্সিয়া'-র ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মড়ক শুরু হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ইউট্রোফিকেশন', যেখানে প্রাণবন্ত জলাশয় ধীরে ধীরে প্রাণহীন বদ্ধ নর্দমায় পরিণত হয়।

এর প্রভাব পরিবেশ ছাড়িয়ে জনজীবনেও আঘাত হানছে। কচুরিপানায় ভরে থাকা জলাশয় মশার আদর্শ আঁতুড়ঘর হয়ে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এই সর্বনাশ কি অজানা? উত্তর স্পষ্ট— না। তবুও পরিকল্পিত অপসারণ ও জনসচেতনতার অভাবে কচুরিপানা আজ যথার্থই 'টেরর অফ বেঙ্গল'। কারণ প্রকৃতি ক্ষমা করে না, সে কেবল হিসাব রাখে।

সৌম্যজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বাদকুল্লা, নদিয়া

স মা ন্ত রা ল

গানের গাঁইগোত্র

এক ঝাঁক ঝকঝকে যুবক প্রায় ঝাঁপিয়ে কলকলিয়ে ট্রেনে উঠে আশপাশের ফাঁকা সিটগুলিতে এসে বসল। বর্ষশেষের সমবেত উদ্‌যাপনের গেট টুগেদার বোধ হয়। একের পর এক স্টেশন অতিক্রম করার সঙ্গে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাদের আলোচনা উপভোগ করছিলাম। অবশেষে এল সেই গানের প্রসঙ্গ। একজন বলল, 'মেহবুব চাচা বছর শেষের মুখে এ কী কেলো করল মাইরি। তিনি নাকি স্কুলের মালিক, শিক্ষার প্রসারী! নিজের স্কুলের অনুষ্ঠানে গায়িকাকে ডেকে এনে সর্বসমক্ষে হেনস্থা!' অন্য আর একজন বলে, ''দেবী চৌধুরানী' সিনেমার 'জাগো জাগো ভৈরবী, জাগো জাগো মা' গানটা একাধিক বার শুনলাম, কই, কোনও ধর্মের প্রতি আঘাতের কোনও চিহ্ন তো পেলাম না! অথচ মেহবুবজির এত সাহস যে মঞ্চে উঠে গায়িকাকে বলে কি না 'অনেক 'জাগো মা' হয়েছে, এবার সেকুলার গান গা!' অন্য এক বন্ধু বলল, 'আরে বুঝলি না, উনি সেকুলার গান মানে সেকু গান, মানে সেক্সি গান শুনতে চাইছিলেন।'

এর পর সমবেত হাসি ও হাততালি সহযোগে শুরু হল 'শোলে' সিনেমায় হেলেন-নৃত্যে আর ডি বর্মনের গাওয়া 'মেহবুবা ও মেহবুবা' গানটি গাওয়া। বয়সোচিত বৈষম্যের কারণে শিং ভেঙে বাছুরের দলে আছি মনে করে বিব্রত বোধ করলেও নবীন প্রজন্ম সেকুলার গানকে কী ভাবে টন্ট করছে, তার একটা নমুনা তো সংগ্রহে এল!

সত্যি বলতে কী, বর্ষশেষে 'সেকুলার' শব্দটা গানের সঙ্গে এমন ভাবে জুড়ে গেল যে এই নব-সংযুক্তি নতুন বছরে কী রকম খেল দেখাবে তা নিয়ে ভয় হচ্ছে। এই অজুহাতে দিকে দিকে গানের কথার উপর খবরদারি না শুরু হয়ে যায়!

ভগবানপুরের এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে নদিয়ায় এক গায়িকার মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে একই ভাবে হুমকি দেওয়া হলো, 'এই সব গান চলবে না'। বাংলাদেশের ফরিদপুরেও সে দেশের অন্যতম সেরা রকস্টারের কনসার্ট ভয়ঙ্কর ভাবে ভণ্ডুল করে দিয়ে বলা হলো, 'এই সব গান চলবে না।' এই লিরিকাল টেররিজ়ম দেখেই ভয় হয়, 'মা', 'মাতা', 'জননী', 'ভগবান', 'ঈশ্বর', 'প্রণাম' ইত্যাদি শব্দযুক্ত লিরিকস শুনে একদল আসর পণ্ড করলে, অন্য দল 'আম্মা', 'আব্বা', খোদা, 'আল্লা', 'মহম্মদ' ইত্যাদি শব্দযুক্ত গান বন্ধের ফতোয়া না দেয়! জলসায় পছন্দের গান চিরকুটে লিখে শোনানোর আবদারের পরিবর্তে 'এই সব গান চলবে না' বলে শিল্পীদের মঞ্চচ্যুত করা না শুরু হয়।

রবি ঠাকুর বলেছিলেন মেয়েদের গলার গান ভালো শোনায়, তাতে আবহাওয়া বেশ একটু মধুর হয়। যা বর্ষশেষের অভিজ্ঞতা তা শঙ্কিত করছে যে, এই নতুন বছরটিতে গায়িকাদের জড়িয়ে আবহাওয়া তিক্ততর হয়ে উঠবে না তো?

বর্ষশেষে 'সেকুলার' শব্দটা গানের সঙ্গে এমন ভাবে জুড়ে গেল যে, এই নব-সংযুক্তি নতুন বছরে কী রকম খেল দেখাবে, তা নিয়ে ভয় হচ্ছে।

কল্যাণ বসু

সমসাময়িক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠান।

পাঠান ই-মেল করে। শব্দসংখ্যা ৮০০-৮৫০। ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'এই সময় প্রবন্ধ'। সঙ্গে পাঠান আপনার মুখের ছবি, পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর ও ঠিকানা। ই-মেল আইডি: uttarsampadakiya.eisamay@gmail.com